ইউনিট ১০

সাওম ও কুরবানী

সাওম ও কুরবানী ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ দু'টি ইবাদত। প্রথমটি সম্পূর্ণভাবে শারীরিক ইবাদত এবং দ্বিতীয়টি একটি আর্থিক ইবাদত। সাওমের রয়েছে বিভিন্ন প্রকারভেদ ও নির্দিষ্ট নিয়মপদ্ধতি। এর সঙ্গে সাদাকাতুল ফিতর নামীয় একটি আর্থিক ইবাদতও জড়িত রয়েছে, যা আদায় করার ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলতে হয়। অনুরূপভাবে যবাই ও কুরবানীর ক্ষেত্রেও শরীআত নির্ধারিত বেশ কিছু নিয়মনীতি আছে, যা পালন না করলে সঠিকভাবে কুরবানী আদায় হবে না। এ বিষয়গুলো অত্র ইউনিটে আলোচিত হয়েছে। এ ইউনিটকে আমরা দু'টি পাঠে বর্ণনা করেছি।

এ ইউনিটের পাঠগুলো নিম্নরূপ

❖ পাঠ-১ : সাওম ও সাদাকাতুল ফিতর
❖ পাঠ-২ : যবাই ও কুরবানী

পাঠ-১

সাওম ও সাদাকাতুল ফিতর

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি–

- সাওম-এর সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- সাওম-এর প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন;
- সাওম ভঙ্গের কারণসমূহ লিখতে পারবেন;
- সাদাকাতুল ফিতরের বিধান আলোচনা করতে পারবেন।

সাওম বা রোযা

ইসলামী জীবন দর্শনের পঞ্চ স্তম্ভের অন্যতম স্তম্ভ হচ্ছে সাওম বা রোযা। ইবাদত হিসেবে সাওমের গুরুত্ব অপরিসীম ও অতুলনীয়। প্রকৃত তাকওয়া বা খোদাভীতি এবং খোদাপ্রেম সৃষ্টির ক্ষেত্রে রোযা এক অতুলনীয় ইবাদত। আত্মসংযম, আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মশুদ্ধি, আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে সাওম এক অনিবার্য ও অপরিহার্য ইবাদত। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, পারস্পরিক সম্প্রীতি, সহানুভূতি ও সাম্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে রোযার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের নৈতিক ও দৈহিক শৃঙ্খলা বিধানে সাওমের ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

সাওমের পরিচয়

রোযা শব্দটি ফারসি শব্দ-এর আরবী পরিভাষা সাওম ও সিয়াম। আভিধানিক অর্থ- বিরত থাকা, কঠোর সাধনা, অবিরাম প্রচেষ্টা, আত্মসংযম ইত্যাদি।

ইসলামী শরীআতের পরিভাষায় মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সুবহে সাদিকের আভা ফুটে উঠার পূর্ব থেকে সাওমের নিয়্যাতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যাবতীয় ইন্দ্রিয় তৃপ্তি হতে বিরত থাকার নাম সিয়াম বা সাওম। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম, স্বাধীন, সুস্থ, বুদ্ধিমান নর-নারীর ওপর পবিত্র রমযান মাসের রোযা রাখা ফরয। অসুস্থ ব্যক্তি, পর্যটক, দুগ্ধপোষ্য শিশুর মা, বার্ধক্যগ্রস্থ দুর্বল ব্যক্তি, আল্লাহর পথে যুদ্ধে নিয়োজিত ব্যক্তি প্রভৃতির জন্য সাওম আবশ্যিক নয়। তবে যে ক'টি রোযা এসব কারণে পালন করা যায়নি, তা পরবর্তী সময়ে সুবিধামত এগার মাসের যে কোন সময় পালন করতে হয়।

ইসলামী শরীআতের পরিভাষায় রোযা বা সাওমের সংজ্ঞা হচ্ছে– মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সুবহে সাদিকের আভা ফুটে উঠার পূর্ব থেকে সাওমের নিয়্যতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যাবতীয় ইন্দ্রিয় তৃপ্তি হতে বিরত থাকার নাম সিয়াম বা সাওম।

রোযার প্রকারভেদ

রোযা মোট ৮ প্রকার– (১) নির্ধারিত ফরয (২) অনির্ধারিত ফরয (৩) নির্ধারিত ওয়াজিব (৪) অনির্ধারিত ওয়াজিব (৫) সুন্নাত (৬) মুস্তাহাব (৭) মাকরূহ তাহরীমী ও (৮) মাকরূহ তানযিহী।

১. **নির্ধারিত ফরয রোযা** বলতে রমযানের রোযাকে বুঝানো হয়।

২. **অনির্ধারিত ফরয রোযা** বলতে রমযানের কাযা রোযা এবং সর্বপ্রকার কাফফারার রোযাকে বুঝানো হয়। কারণ এসব রোযা কোন বিশেষ সময়ের সাথে নির্ধারিত নয়।

৩. **নির্ধারিত ওয়াজিব রোযা** বলতে নির্ধারিত দিনের মানতের রোযাকে বুঝানো হয়। যেমন– কেউ বৃহস্পতিবার দিন রোযা রাখবে বলে মানত করল।

৪. **অনির্ধারিত ওয়াজিব রোযা** বলতে দিনের উল্লেখ না করে রোযা রাখার মানত করা। নফল কোন নির্ধারিত রোযা রেখে ভেঙ্গে ফেলার পর তা কাযা করা অনির্ধারিত ওয়াজিব রোযার অন্তর্ভুক্ত।

৫. **সুন্নাত রোযা।** যথা আশুরার রোযা। তবে আশুরার আগের দিন ও পরের দিনসহ রোযা রাখা সুন্নাত।

৬. **মুস্তাহাব রোযা।** প্রতি আরবী মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোযা, জুমুআর দিনের রোযা এবং আরাফার দিনের রোযা ইত্যাদি।

৭. **মাকরূহ তাহরীমী বা কার্যত হারাম রোযা।** যথা- দুই ঈদের দিন ও আইয়ামে তাশরীক তথা যিলহজ্জের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে রোযা রাখা।

৮. **মাকরূহ তানযীহী রোযা।** যথা- কেবল আশুরার দিন রোযা রাখা। কারণ এতে ইয়াহূদীদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যায়। শুধু শনিবার রোযা রাখা। কারণ তাতেও ইয়াহূদীদের সাথে মিল হয়ে যায়। শুধু সৌরবর্ষের প্রথম দিনে রোযা রাখা। পারসিকগণের উৎসবের দিন রোযা রাখা ইত্যাদি।

রোযার নিয়্যাত

- রোযার নিয়্যাত একটি অপরিহার্য বিষয়। রমযানের রোযার নিয়্যাত রাত হতে দুপুরের ঘণ্টাখানেক পূর্ব পর্যন্ত যে কোনো সময়ে করে নিলে তা সঠিক হবে। তবে রাতে করাই উত্তম।
- কোন মুকীম (মুসাফির নয় এমন) ব্যক্তি রমযানের দিন যদি নফল রোযা বা অন্য কোন ওয়াজিব রোযার নিয়্যাত করে তবে তার রমযানের রোযাই পালন হবে। কারণ তা শরীআতের পক্ষ হতে নির্ধারিত। কোন মুসাফির বা অসুস্থ ব্যক্তি যদি রমযান মাসে শুধু রোযার নিয়্যাত করে অথবা নফল রোযার নিয়্যাত করে তবে রমযানের রোযাই আদায় হবে।
- কারো উপর পূর্ববর্তী রমযান মাসের কাযা রোযা অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় পরবর্তী রমযানের মাস এসে গেলে সে চলতি রমযানের রোযাই রাখবে। এক্ষেত্রে কাযার নিয়্যাত করলেও রমযানের রোযাই আদায় হবে। রমযানের পর পূর্বের কাযা রোযা আদায় করবে।
- কাযা রোযার নিয়্যাত রাতে করাই শর্ত। কেউ কাযা রোযার নিয়্যাত দিনের বেলা করলেও তার রোযা নফলে পরিণত হবে।
- বিভিন্ন বিধিবদ্ধ সমস্যার কারণে যে সকল রোযা রাখা সম্ভব হয়নি রমযানের পর যথাশীঘ্র সম্ভব তার কাযা করতে হবে। বিনা কারণে কাযা রোযা বিলম্ব করা পাপ। কাযা রোযা পালনের জন্য এরূপ দিন তারিখ নির্দিষ্ট করা জরুরি নয় যে, আমি অমুক তারিখে রোযা রাখছি। যত সংখ্যক রোযা কাযা হয়েছে ততটি আদায় করলেই কাযা পালন হয়ে যাবে। অবশ্য দুই বা ততোধিক বছরের রোযা কাযা হলে কাযা আদায় করার সময় কোন বছরের কাযা রোযা তা উল্লেখ করা জরুরি।
- যে কয়টি রোযা কাযা হয়েছে, তা এক সাথে বা ভিন্ন ভিন্নভাবেও করা যায়। কাফফারার রোযার নিয়্যাতও রাতে করা আবশ্যক। কাফফারার রোযার নিয়্যাত দিনে করলে কাফফারার রোযা আদায় হবে না।
- নির্দিষ্ট দিনের মানতের রোযার নিয়্যাত রাতে করা শর্ত নয় বরং রাত থেকে দ্বিপ্রহরের ঘণ্টা খানেক পূর্ব পর্যন্ত যে কোন সময় নিয়্যাত করলেই মানতের রোযা বৈধ হয়ে যাবে।
- নির্দিষ্ট মানতের রোযা কোন কারণবশত সে দিনে আদায় করতে না পারলে এর কাযা আদায় করার সময় রাতেই নিয়্যাত করা শর্ত।
- অনির্দিষ্ট মানতের রোযা, নফল রোযা, কাযা রোযা ইত্যাদির নিয়্যাত রাতেই করা শর্ত এবং কিসের রোযা পালন করা হচ্ছে তার উল্লেখ করতে হবে। নির্দিষ্টভাবে নিয়্যাত করতে হবে যে সে কিসের রোযা রেখেছে।
- ফরয ও ওয়াজিব ছাড়া সুন্নাত, নফল ও মুসতাহাব রোযা নফল রোযার অন্তর্ভুক্ত। নফল রোযার নিয়্যাত রাত হতে দুপুর এক ঘণ্টার পূর্ব পর্যন্ত যে কোন সময় করা জায়েয। সুবহে সাদিকের পূর্বে নিয়্যাত করা শর্ত নয়। শুধু একটু নিয়্যাত করলে নফল রোযা আদায় হয়ে যাবে, আমি রোযা রাখছি। নফল রোযা রেখেছি বলে নিয়্যাতকে নির্দিষ্ট করার দরকার নেই।
- নফল রোযা কোন কারণে ভঙ্গ হয়ে গেলে তার কাযা আদায় করার সময় নিয়্যাত নির্দিষ্ট করা ও রাতে নিয়্যাত করা শর্ত। নফল রোযা রাখার পর কেউ যদি তা ভেঙ্গে ফেলে তবে তার উপর এ রোযার কাযা ওয়াজিব হবে।
- নিষিদ্ধ পাঁচ দিনে রোযা রাখা হারাম সেসব দিনে রোযা রেখে ভেঙ্গে ফেললে তার কাযা ওয়াজিব হবে না। আর নফল রোযা শুরু করে বিনা ওযরে ভেঙ্গে ফেলা উচিত নয়।
- রমযানের কাযা রোযার মত সকল প্রকার কাফফারার রোযার বেলায়ও রাত থাকতেই নিয়্যাত করতে হয়।
- কাফফারা একমাত্র ওয়াজিব হয় রমযানের ফরয রোযা ইচ্ছাকৃতভাবে ভঙ্গ করলে। রমযানের কাযা রোযা বা অন্য রোযা ভঙ্গ করলে কাফফারা ওয়াজিব হয় না। রমযানের রোযার কাফফারা হল একাধারে দুইমাস রোযা রাখা। কোন কারণে মধ্য হতে দু'একটি রোযা না রাখতে পারলে আবার পুনরায় দুই মাস রোযা রাখতে হবে। মহিলাগণের মাসিকের কারণে কিছু রোযা ছুটে গেলে এ কারণে কাফফারার রোযা আদায়ে ব্যাঘাত ঘটবে না। তবে পবিত্রতা লাভের পরপরই বাকি রোযা পূর্ণ করে নিতে হবে। নিফাসের ক্ষেতে এ হুকুম প্রযোজ্য নয়। এক্ষেত্রে নতুনভাবে আবার ষাটটি রোযা রাখতে হবে।
- কাফফারার রোযা আদায়কালে রমযান মাস এসে গেলেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। রোযা রাখতে কেউ সক্ষম না হলে ষাটজন মিসকীনকে সকাল-সন্ধ্যা দু'বেলা পেট ভরে খাওয়াবে। আহার না করিয়ে ষাটজন মিসকীনকে সাদাকায়ে ফিতর পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য দিলেও জায়েয হবে। এমনিভাবে এর সমপরিমাণ মূল্য দিয়ে দেওয়াও জায়েয।

বিভিন্ন বিধিবদ্ধ সমস্যার কারণে যে সকল রোযা রাখা সম্ভব হয়নি রমযানের পর যথাশীঘ্র সম্ভব তার কাযা রাখতে হবে। বিনা কারণে কাযা রোযা বিলম্ব করা পাপ।

ফরয ও ওয়াজিব ছাড়া সুন্নাত, নফল ও মুসতাহাব রোযা নফল রোযার অন্তর্ভুক্ত। নফল রোযার নিয়্যাত রাত হতে দুপুরের এক ঘণ্টার পূর্ব পর্যন্ত যে কোন সময় করা জায়েয।

কাফ্ফারা একমাত্র ওয়াজিব হয় রমযানের ফরয রোযা ইচ্ছাকৃতভাবে ভঙ্গ করলে। রমযানের রোযার কাফফারা হল একাধারে দুইমাস রোযা রাখা।

রোযাদার ব্যক্তি যদি খাদ্যদ্রব্য বা ওষুধ ইচ্ছাপূর্বক গ্রহণ করে তবে তার উপর কাফফারা ও কাযা ওয়াজিব হবে। অনিচ্ছাপূর্বক খাদ্য বা ওষুধ গ্রহণ করলে তার উপর শুধু কাযা ওয়াজিব হবে।

রোযা ভঙ্গের কারণসমূহ

রোযা ভঙ্গের কারণসমূহ দুই প্রকার : (১) যেসব কারণে শুধুমাত্র কাযা ওয়াজিব হয়। (২) যে সব কারণে কাযা ও কাফফারা উভয়ই ওয়াজিব হয়।

যে সব কারণে রোযার কাযা ও কাফফারা উভয় ওয়াজিব হয় তা নিম্নরূপ

রোযাদার ব্যক্তি যদি খাদ্যদ্রব্য বা ওষুধ ইচ্ছাপূর্বক গ্রহণ করে তবে তার উপর কাফফারা ও কাযা ওয়াজিব হবে। অনিচ্ছাপূর্বক খাদ্য বা ওষুধ গ্রহণ করলে তার উপর শুধু কাযা ওয়াজিব হবে।

রোযাদার ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক স্ত্রী সহবাস করলে তার উপর কাযা ও কাফফারা উভয় ওয়াজিব হয়। এ ব্যাপারে

মহিলাও যদি আগ্রহী থাকে তবে তার উপরও কাযা ও কাফফারা ওয়াজিব। কোন মহিলার সঙ্গে জোরপূর্বক সহবাস করা হলে এরূপ মহিলার উপর কেবল কাযা ওয়াজিব হবে।

সুবহে সাদিক হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস সত্ত্বেও কেউ সাহরী খেয়ে নিলে অথবা সূর্য অস্ত যায়নি এ দৃঢ়বিশ্বাস সত্ত্বেও কেউ ইফতার করে ফেললে তার উপর কাযা ও কাফফারা উভয় ওয়াজিব হবে।

যে সব কারণে শুধু কাযা ওয়াজিব হয়

- সুবহে সাদিক আরম্ভ হয়নি মনে করে কেউ সাহরী খেল অথচ সুবহে সাদিক হয়ে গিয়েছে অথবা সূর্য অস্ত গিয়েছে মনে করে কেউ ইফতার করল কিন্তু তখনও সূর্য অস্ত যায়নি এ অবস্থায় ঐ লোকের উপর শুধু কাযা ওয়াজিব হবে, কাফফারা ওয়াজিব হবে না।
- জোরপূর্বক কেউ খাইয়ে দিলে কিংবা সাবধানতা সত্ত্বেও হঠাৎ কিছু পেটে চলে গেলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং এতে কাযা ওয়াজিব হবে।
- কামভাবের সাথে স্ত্রীলোককে চুম্বন অথবা স্পর্শ করার পর বীর্য নির্গত হলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে তবে কেবল পুরুষের উপরই কাযা ওয়াজিব হবে।
- মুখে কোন খাবার অবশিষ্ট রেখে সুবহে সাদিকের পর পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং তার উপর শুধু কাযা ওয়াজিব হবে।
- মুখ, নাক অথবা পায়খানার রাস্তা দিয়ে ওষুধ প্রবেশ করালে কিংবা কান দিয়ে ওষুধ ঢাললে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়, এর জন্য শুধু কাযা ওয়াজিব হবে।
- পেটে বা মাথার ক্ষতস্থানে ওষুধ ঢাললে তা পেটে বা মাথায় পৌঁছে গেলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং এর জন্য কাযা ওয়াজিব হবে।
- অনিচ্ছাকৃত মুখ ভরে বমি হলেও রোযা ভঙ্গ হয় না। মুখ ভরে বমি হওয়ার পর তা যদি পুনরায় পেটে ঢুকানো হয় তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি বমি নিজে নিজেই পেটে ঢুকে পড়ে তবে রোযা ভঙ্গ হবে না। আর যদি তা ইচ্ছা করে ফেরানো হয় তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে রোযা ভঙ্গ হবে না, এটাই বিশুদ্ধ মত। যদি ইচ্ছা করে কেউ বমি করে এবং তা মুখ ভরে হয় তবে তার রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে। এসব ক্ষেত্রে শুধু কাযা ওয়াজিব হবে।
- লোবান ইত্যাদির ধোঁয়া শুঁকলে, বিড়ি, সিগারেট বা হুক্কা পান করলেও রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়। আতর গোলাপ ইত্যাদি যেগুলোর মধ্যে ধোঁয়া নেই সেগুলোর সুগন্ধি শুঁকলে রোযা ভঙ্গ হয় না।
- কোন লোক যদি রোযাদারের প্রতি কিছু নিক্ষেপ করে আর তা গলায় প্রবেশ করে তবে এতে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। অনুরূপ গোসলের সময় গলায় পানি ঢুকে পড়লে এতেও রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে।
- দাঁতের ভেতর আটকে থাকা জিনিস খেয়ে ফেললে যদি তা চানাবুট পরিমাণ হয় তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে আর এর চেয়ে ছোট বস্তু হলে রোযা ভঙ্গ হবে না। তবে যদি তা মুখ থেকে বের করে আবার খেয়ে ফেলে তবে ভঙ্গ হয়ে যাবে। এসব ক্ষেত্রে শুধু কাযা ওয়াজিব হবে।
- বৃষ্টির পানি ও বরফ গলার ভেতর চলে গেলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এক দুই ফোটা চোখের পানি মুখের ভেতর প্রবেশ করলে রোযা ভঙ্গ হয় না। অনেক পানি মুখের ভেতর জমে গেলে যদি সারা মুখ লবণাক্ততা অনুভব হয় আর তা জমা করে গিলে ফেলে তবে রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে। এসব ক্ষেত্রে কাযা ওয়াজিব হবে।
- ইসতিনযার সময় অতিরিক্ত পানি ব্যবহারের ফলে যদি পানি পায়খানার রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করে তবে রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে এবং কাযা ওয়াজিব হবে।

দাঁতের ভেতর আটকে থাকা জিনিস খেয়ে ফেললে যদি তা চানাবুট পরিমাণ হয় তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে আর এর চেয়ে ছোট বস্তু হলে রোযা ভঙ্গ হবে না।

রোযার কথা ভুলে গিয়ে রোযাদার ব্যক্তি যদি পানাহার করে বা স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত হয়, তাহলে রোযা ভঙ্গ হয় না।

যে সব কারণে রোযা ভঙ্গ হয় না

- রোযার কথা ভুলে গিয়ে রোযাদার ব্যক্তি যদি পানাহার করে বা স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত হয় তাহলে কোন প্রকার রোযা ভঙ্গ হয় না।
- এক ব্যক্তি দেখতে পেল এক রোযাদার ব্যক্তি ভুলক্রমে খানা খাচ্ছে। লোকটি যদি এরূপ সবল হয়, যে রাত পর্যন্ত তার পক্ষে রোযা পূর্ণ করা সম্ভব, তবে ঐ রোযাদারকে রোযার কথা স্মরণ করিয়ে না দেওয়া মাকরূহ। বয়োঃবৃদ্ধতার ফলে লোকটি যদি দুর্বল হয়, তবে তাকে স্মরণ করিয়ে না দেওয়ার অনুমতি রয়েছে।
- কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার সময় যদি পেটের ভেতর চলে যায় এবং রোযার কথা স্মরণ না থাকে তবে রোযা ভঙ্গ হয় না। আর যদি রোযার কথা স্মরণ থাকে তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়।
- দাঁতের ফাকে চানা বুটের চেয়ে ছোট কিছু থাকলে এবং তা গিলে ফেললে রোযা ভঙ্গ হয় না। গমের একটি দানা চিবালে রোযা ভঙ্গ হয় না।
- কুলি করার পর পানির আর্দ্রতা মুখে বাকি থাকতে তা থুথুর সাথে গিলে ফেললে রোযা ভঙ্গ হয় না।
- যে জিনিস খাদ্যদ্রব্য নয় আর তা হতে সাধারণত বেঁচেও থাকা যায় না, যেমন– মশা-মাছি ইত্যাদি গলার ভেতর চলে গেলে রোযা ভঙ্গ হয় না।
- কোন মহিলার প্রতি দৃষ্টিপাত করা অথবা সহবাসের ধ্যান করার ফলে বীর্য নির্গত হলে রোযা ভঙ্গ হবে না। স্ত্রীকে স্পর্শ করার পর তার শরীরে উষ্ণতা অনুভব করার ফলে বীর্য নির্গত হলে রোযা ভঙ্গ হবে।

- পানিতে ডুব দেওয়ার ফলে কানে পানি প্রবেশ করলে রোযা ভঙ্গ হয় না।
- কেউ পান খেয়ে ভালভাবে কুলি করে মুখ পরিষ্কার করা সত্ত্বেও থুথু-লালা থেকে গেলে এতে রোযার কোন ক্ষতি হয় না।
- রাতে গোসলের প্রয়োজন হওয়া সত্ত্বেও দিনে গোসল করলে রোযা ভঙ্গ হবে না। সারা দিনের মধ্যে গোসল না করলেও রোযা ভঙ্গ হবে না, তবে গুনাহগার হবে।
- পরীক্ষা করার জন্য শরীর থেকে রক্ত নেওয়া হলে রোযা ভঙ্গ হয় না।

যেসব কারণে রোযা মাকরূহ হয় এবং যে সব কারণে মাকরূহ হয় না

কারো এমনভাবে দুর্বল হয়ে পড়ার যদি আশঙ্কা না হয় যার ফলে রোযা ভঙ্গ করতে হয়, তাহলে শরীরে শিঙ্গা লাগানো বৈধ। তবে রোযা ভঙ্গ করার মত দুর্বলতার আশঙ্কা হলে শিঙ্গা লাগানো মাকরূহ।

- বিনা ওজরে কোনো কিছুর স্বাদ গ্রহণ করা ও চিবানো মাকরূহ। স্বামী যদি বদমেজাজী হয় তাহলে স্ত্রীর জন্য খাদ্যের স্বাদ জিহ্বা দ্বারা পরীক্ষা করে নেওয়া মাকরূহ নয়। অনুরূপভাবে শিশুর খাদ্য চিবিয়ে দিলে রোযা মাকরূহ হবে না।
- পানিতে বায়ু নিঃসরণ করা মাকরূহ। রোযা অবস্থায় ইচ্ছাপূর্বক মুখে থুথু জমা করে তা গিলে ফেলা মাকরূহ। রোযাদার ব্যক্তির জন্য দিনের যে কোনো সময় মিসওয়াক করা জায়েয। এতে রোযার কোন ক্ষতি নেই।
- চোখে সুরমা লাগানো এবং গোঁফে তেল মাখা রোযাদারের জন্য মাকরূহ। তবে সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য এরূপ করা রোযাদার-অরোযাদার সবার জন্যই মাকরূহ।
- কাউকে এমনভাবে দুর্বল হয়ে পড়ার যদি আশঙ্কা না হয় যার ফলে রোযা ভঙ্গ করতে হয়, তাহলে শরীরে শিঙ্গা লাগানো বৈধ। তবে রোযা ভঙ্গ করার মত দুর্বলতার আশঙ্কা হলে শিঙ্গা লাগানো মাকরূহ।
- ইমাম আযম আবু হানীফা (র.)-এর মতে, রোযা অবস্থায় মুখে পানি নিয়ে বারবার কুলি করা, মাথায় পানি ঢালা এবং ভিজা কাপড় শরীরে জড়িয়ে রাখা মাকরূহ।
- কয়লা ও মাজন দ্বারা দাঁত মাজা মাকরূহ। মাজনের সামান্য কিছু অংশ গলার ভিতরে চলে গেলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়।

যে সব অবস্থায় রোযা না রাখা জায়েয

অসুস্থ ব্যক্তি যদি রোযা রাখার কারণে কোন শারীরিক গুরুতর ক্ষতি বা মৃত্যুর আশঙ্কাবোধ করে তবে এ অবস্থায় সে রোযা রাখবে না। সুস্থ হওয়ার পর কাযা করবে।

অসুস্থ ব্যক্তি যদি রোযা রাখার কারণে কোন শারীরিক গুরুতর ক্ষতি বা মৃত্যুর আশঙ্কাবোধ করে তবে এ অবস্থায় সে রোযা রাখবে না। সুস্থ হওয়ার পর কাযা করবে। শুধু মনের ধারণায় রোযা না রাখা বৈধ নয়। কিন্তু যখন কোন নীতিবান ও দক্ষ ডাক্তার বলে, রোযা রাখলে ক্ষতি হবে অথবা নিজের পূর্ব অভিজ্ঞতা কিংবা কোন লক্ষণ দ্বারা প্রবল ধারণা জন্মে যে, রোযা রাখলে ক্ষতি হবে তখন রোযা না রাখা বৈধ।

যে সব কারণে রোযা ভঙ্গ করা জায়েয

- হঠাৎ কেউ এমন অসুস্থ হয়ে পড়ল যে, রোযা রাখলে প্রাণের আশঙ্কা কিংবা রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা দেখা দিবে, তখন রোযা ভেঙ্গে ফেলা জায়েয।
- অনুরূপ সাপে দংশন করলে ওষুধ সেবনের জন্য রোযা ভেঙ্গে ফেলা জায়েয।
- গর্ভবতী মহিলা রোযা রাখলে যদি তার নিজের অথবা পেটের বাচ্চার জীবন বিপন্নের আশঙ্কা করে তবে রোযা ভেঙ্গে ফেলা জায়েয।

সাদাকাতুল ফিতর

গম, গমের আটা, যব, যবের আটা এবং খেঁজুর ও কিসমিস দ্বারা ফিতরা আদায় করা যায়। গম বা গমের আটা দ্বারা ফিতরা আদায় করলে গম অর্ধ সা' (১ কেজি ৭৫০ গ্রাম) এবং যব বা যবের আটা কিংবা খেজুর দিয়ে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করলে এক সা (৩ কেজি ৫০০ গ্রাম) দিতে হবে। রুটি, চাউল বা অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য দিয়ে ফিতরা দিতে হলে মূল্য হিসেবে দিতে হবে।

রমযান মাস শেষে ঈদুল ফিতরের দিন দরিদ্রদেরকে যে সম্পদ দেওয়া হয় তাকে সাদাকাতুল ফিতর বলে। মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত যাকাতের নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক প্রত্যেক মুসলিম নারী-পুরুষের উপর 'সাদাকাতুল ফিতর' ওয়াজিব। স্ত্রী এবং বালেগ সন্তানের ফিতরা নিজেরাই আদায় করবে। স্বামী এবং পিতার উপর তাদের ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব নয়। তবে তারা দিলে আদায় হয়ে যাবে।

সাদাকাতুল ফিতরের পরিমাণ

গম, গমের আটা, যব, যবের আটা এবং খেঁজুর ও কিসমিস দ্বারা ফিতরা আদায় করা যায়। গম বা গমের আটা দ্বারা ফিতরা আদায় করলে গম অর্ধ সা' (১ কেজি ৭৫০ গ্রাম) এবং যব বা যবের আটা কিংবা খেজুর দিয়ে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করলে এক সা (৩ কেজি ৫০০ গ্রাম) দিতে হবে। রুটি, চাউল বা অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য দিয়ে ফিতরা দিতে হলে মূল্য হিসেবে দিতে হবে।

কিসমিস দিয়ে ফিতরা আদায় করলে এক সা' দিতে হবে। দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্যদ্রব্য দিয়ে ফিতরা আদায় করা উত্তম। আর অন্য সময় মূল্য দিয়ে ফিতরা আদায় করা উত্তম।

সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার সময়

সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার সময় হল ঈদুল ফিতরের দিন সুবহে সাদিক হওয়ার পর। সুবহে সাদিকের পূর্বে কেউ মারা গেলে তার উপর ফিতরা ওয়াজিব হবে না। সুবহে সাদিকের পর কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করলে কিংবা কেউ মুসলমান হলে তার উপর ফিতরা ওয়াজিব হবে। অনুরূপ কোন দরিদ্র ব্যক্তি সুবহে সাদিকের পূর্বে বিত্তশালী হলে তার উপর ফিতরা ওয়াজিব হবে। ধনী ব্যক্তি সুবহে সাদিকের পূর্বে দরিদ্র হয়ে গেলে তার উপর ফিতরা ওয়াজিব হবে না। ঈদুল ফিতরের দিনের পূর্বে ফিতরা আদায় করা বৈধ। ঈদুল ফিতরের দিন আদায় না

করলেও পরে তা আদায় করতে হবে। ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হবার পূর্বে ফিতরা আদায় করা মুস্তাহাব।

নিজের এবং নিজের নাবালেগ সন্তানের পক্ষ হতে ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব। নিজ পরিবারভুক্ত নয় এমন লোকের পক্ষ থেকে তার অনুমতি ছাড়া ফিতরা দিলে আদায় হবে না। কোনো ব্যক্তির উপর তার পিতামাতার এবং ছোট ভাইবোন ও নিকটাত্মীয়ের পক্ষ হতে ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব নয়।

এক ব্যক্তির ফিতরা এক মিসকীনকে দেওয়া উত্তম। তবে একাধিক মিসকীনকে দেওয়াও জায়েয। একদল লোকের উপর যে ফিতরা ওয়াজিব তা এক মিসকীনকে দেওয়াও জায়েয।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. অনির্ধারিত ফরয রোযা বলতে কী বুঝায়?
   ক. রমযানের ফরয রোযা; খ. রমযানের কাযা রোযা;
   গ. মানতের রোযা; ঘ. আশুরার রোযা।
২. নফল রোযার নিয়্যাত-
   ক. রাতেই করতে হয়; খ. রাত থেকে দুপুরের এক ঘন্টা পূর্বে করে নিতে হয়;
   গ. সকাল আটটার আগেই করে নিতে হয়; ঘ. ইফতারের আগেই করে নিতে হয়।
৩. কাফফারা ওয়াজিব হয়-
   ক. রমযানের রোযা ইচ্ছাপূর্বক ভঙ্গ করলে; খ. মানতের রোযা ভঙ্গ করলে;
   গ. রমযানের রোযা ভুলক্রমে ভঙ্গ করলে; ঘ. অসুস্থতার কারণে রোযা ভঙ্গ করলে।
৪. সাদাকাতুল ফিতর-
   ক. ঈদুল ফিতরের দিন দেওয়া হয়; খ. আশুরার দিন দেওয়া হয়;
   গ. ঈদুল আযহার দিন দেওয়া হয়; ঘ. রমযানের শেষ দশদিনে দেওয়া হয়।
৫. কুলি করার সময় পেটে পানি গেলে-
   ক. রোযা মাকরূহ হয়ে যায়; খ. রোযা ভঙ্গা হয়ে যায়;
   গ. রোযার কিছুই হয় না; ঘ. রোযা ভেঙ্গে যায় এবং কাফফারা দিতে হয়।

সংক্ষিপ্ত উত্তর–প্রশ্ন

১. রোযা কত প্রকার ও কী কী? আলোচনা করুন।
২. বিভিন্ন প্রকার রোযার নিয়্যাত কখন করতে হয়? লিখুন।
৩. কী কী কারণে শুধু রোযার কাযা এবং কী কী কারণে কাযা ও কাফফারা উভয় দিতে হয়? লিখুন।
৪. রোযা ভঙ্গের কারণসমূহ উল্লেখ করুন।
৫. যে সব কারণে রোযা মাকরূহ হয় লিখুন।
৬. যেসব অবস্থায় রোযা না রাখা জায়েয তা বর্ণনা করুন।
৭. সাদাকাতুল ফিতরের পরিমাণ কতটুকু এবং কাদের পক্ষ থেকে আদায় করতে হয়? আলোচনা করুন।
৮. সাদাকাতুল ফিতরের সময় উল্লেখ করুন।

বিশদ উত্তর–প্রশ্ন

১. রোযা কাকে বলে? রোযা কত প্রকার ও কী কী? বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন।
২. রোযা ভঙ্গের কারণ কী কী? কখন শুধু কাযা আদায় করতে হয় এবং কখন কাযা ও কাফফারা উভয় আদায় করতে হয় বিস্তারিতভাবে লিখুন।

পাঠ-২

যবাই ও কুরবানী

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- কুরবানীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- কাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- কুরবানীর বিভিন্ন মাসআলা জানতে পারবেন;
- কুরবানীর দিন ও সময় সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- যবাই করার পদ্ধতি ও কুরবানীর গোশতের বিধান সম্পর্কে বলতে পারবেন।

যবাই ও কুরবানী

কুরবানীকে আরবী ভাষায় 'উযহিয়্যা' বলা হয়। 'উযহিয়্যা' শব্দের আভিধানিক অর্থ হল, ঐ পশু যা কুরবানীর দিন যবাই করা হয়। শরীআতের পরিভাষায় আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট পশু যবাই করাকে কুরবানী বলা হয়।

কুরবানীকে আরবী ভাষায় 'উযহিয়্যা' বলা হয়। 'উযহিয়্যা' শব্দের আভিধানিক অর্থ হল, ঐ পশু যা কুরবানীর দিন যবাই করা হয়। শরীআতের পরিভাষায়, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট পশু যবাই করাকে কুরবানী বলা হয়।

কুরবানীর তাৎপর্য হল, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও প্রিয়বস্তু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করা। মানব ইতিহাসে সর্বপ্রথম কুরবানী হযরত আদম (আ)-এর দুই পুত্র হাবিল ও কাবিল করেছিলেন। এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে;

وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَيْ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ ۘ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ ٱلْآخَرِ

"আদমের দুই পুত্রের বৃত্তান্ত তুমি তাদের শোনাও। যখন তারা উভয়ে কুরবানী করেছিল তখন একজনের কুরবানী কবুল হল এবং অন্যজনের কবুল হল না।" (সূরা আল-মায়িদা : ২৭)

এ কুরবানীর বিধান যুগে যুগে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ সমস্ত শরীআতেই বিদ্যমান ছিল। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে;

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ

"আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কুরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি। তিনি জীবনোপকরণ স্বরূপ যে সকল চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছেন সেগুলোর উপর তারা যেন আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে।" (সূরা আল-হাজ্জ : ৩৪)

মূলত প্রচলিত কুরবানী হযরত ইবরাহীম (আ) -এর অপূর্ব আত্মত্যাগের ঘটনারই স্মৃতিবহ।

মূলত প্রচলিত কুরবানী হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অপূর্ব আত্মত্যাগের ঘটনারই স্মৃতিবহ। এ ঐতিহাসিক ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করেই কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে:

"তারপর সে যখন তার পিতার সাথে কাজ করার মত বয়সে উপনীত হল তখন ইবরাহীম বলল হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবাই করছি, এতে তোমার কী অভিমত? সে বলল, হে আমার পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তাই করুন। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীল হিসেবে পাবেন। যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইবরাহীম তার পুত্রকে কাত করে শায়িত করল তখন আমি তাকে আহবান করে বললাম, হে ইবরাহীম! তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যই পালন করলে। এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয় এ ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তাকে মুক্ত করলাম এক মহান কুরবানীর বিনিময়ে। আমি এটা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি। ইবরাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। এভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেকে পুরস্কৃত করে থাকি।" (সূরা আস-সাফফাত : ১০২)

বস্তুত হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র কুরবানী দেওয়ার এ অবিস্মরণীয় ঘটনাকে প্রাণবন্ত করে রাখার জন্যই উম্মতে মুহাম্মদীর উপরও তা ওয়াজিব করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ

"সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর।" (সূরা আল-কাউসার : ২)

যাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব

যদি মুসলিম, বুদ্ধিমান, বালেগ, মুকীম (মুসাফির নয় এমন) ব্যক্তি ১০ই যিলহজ্জ ফজর হতে ১২ই যিলহজ্জ সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয় তবে তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব।

কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার জন্য যাকাতের নিসাবের মত সম্পদের এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। বরং যে অবস্থায় সাদাকায়ে ফিতর ওয়াজিব হয় ঐ অবস্থায় কুরবানীও ওয়াজিব হবে।

কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার জন্য যাকাতের নিসাবের মত সম্পদের এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। বরং যে অবস্থায় সাদাকায়ে ফিতর ওয়াজিব হয় ঐ অবস্থায় কুরবানীও ওয়াজিব হবে। তবে মুসাফির, পাগল, অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়।

কোন মহিলা নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে।

কুরবানী ওয়াজিব নয় এমন ধরনের কোন দরিদ্র ব্যক্তি কুরবানী করলে তা আদায় হয়ে যাবে এবং বহু সাওয়াবের অধিকারী হবে। এরূপ কোন গরীব ব্যক্তি কুরবানীর নিয়্যাতে পশু খরিদ করলে তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

নিজের পক্ষ থেকে কুরবানী করা ওয়াজিব। সন্তানের পক্ষ থেকে পিতার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব নয়। তবে পিতা যদি নিজের সম্পদ হতে অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলের পক্ষ থেকে কুরবানী করে তাহলে তা নফল হিসাবে গণ্য হবে।

নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক ব্যক্তির উপর শুধু একটি কুরবানী ওয়াজিব। একাধিক কুরবানী করা ওয়াজিব নয়, যদিও সে অধিক সম্পদের মালিক হোক না কেন। অবশ্য যদি কেউ একাধিক কুরবানী করে তবে এতে সে অনেক সাওয়াব লাভ করবে।

ঋণ করে কুরবানী করা ভাল নয়। যখন কোন ব্যক্তির উপর কুরবানীই ওয়াজিব নয় তখন অন্যের কাছ থেকে ধার নিয়ে কুরবানী করার কোন প্রয়োজন নেই।

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করবে। তার জন্য কুরবানী না করাই উত্তম। এরপরও যদি সে কুরবানী করে তাহলে সাওয়াব পাবে।

মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করা জায়েয। আর এতে সে অধিক সাওয়াবের অধিকারী হবে। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পক্ষ থেকে কুরবানী করা বিশেষ সাওয়াবের কাজ।

কুরবানীর পশু ও এর হুকুম

কুরবানীর পশু ছয় প্রকার : উট, গরু, ছাগল, দুম্বা, ভেড়া, মহিষ। এ সমস্ত পশু ব্যতীত অন্য কোন পশু কুরবানী করা জায়েয নয়।

- কুরবানীর পশু ছয় প্রকার : উট, গরু, ছাগল, দুম্বা, ভেড়া, মহিষ। এ সমস্ত পশু ব্যতীত অন্য কোন পশু কুরবানী করা জায়েয নয়।
- দুম্বা, ছাগল, ভেড়া পূর্ণ একবছর বয়সের হলে, কুরবানী দুরস্ত হবে। অবশ্য ছয় মাসের ভেড়া, দুম্বা, মোটাতাজা হলে এবং দেখতে এক বছর বয়সের দেখা গেলে এদের দ্বারা কুরবানী জায়েয। গরু, মহিষ পূর্ণ দুই বছর বয়সী হতে হবে। দুই বছরের কম হলে কুরবানী জায়েয হবে না। উট পাঁচ বছর বয়সের হতে হবে। এর কম হলে কুরবানী জায়েয হবে না।
- দুম্বা, ছাগল, ভেড়াতে মাত্র এক শরীক কুরবানী দেওয়া যায়। গরু, মহিষ ও উট এই তিন প্রকার পশুর এক একটিতে সাত ব্যক্তি পর্যন্ত শরীক হয়ে কুরবানী করতে পারবে। তবে কুরবানীর জন্য শর্ত হল কারও অংশ যেন এক সপ্তমাংশ হতে কম না হয় এবং প্রত্যেক শরীককেই কুরবানীর নিয়্যাত করতে হবে। যদি শরীকদের একজনও শুধু গোশত খাওয়ার নিয়্যাত করে তবে কারও কুরবানী সঠিক হবে না। অনুরূপভাবে যদি কোন শরীকের অংশ সপ্তমাংশ হতে কম হয় তবে সকলের কুরবানীই নষ্ট হয়ে যাবে।
- গরু, মহিষ ও উট এর মধ্যে সাতজনের কম অংশীদার হতে পারে। যেমন- দুই, চার বা এর কম অংশ কেউ নিতে পারে। তবে এখানেও এই শর্ত জরুরি যে, কারও অংশ যেন এক সপ্তমাংশের কম না হয়, নতুবা কারও কুরবানী সহীহ হবে না।
- যদি গরু খরিদ করার পূর্বেই সাতজন ভাগী হয়ে সকলে মিলে খরিদ করে তবে এটা জায়েয। আর যদি কেউ এক কুরবানী করার জন্য একটা গরু খরিদ করে থাকে এবং মনে মনে ইচ্ছা রাখে যে, পরে আরও লোক শরীক করে তাদের সাথে মিলে একত্রে কুরবানী করবে তবে তাও বৈধ হবে। কিন্তু যদি গরু ক্রয় করার সময় অন্যকে শরীক করবার ইচ্ছ না থাকে, একা একাই কুরবানী করার নিয়্যাত করে থাকে তারপর যদি অন্যকে শরীক করতে চায় এমতাবস্থায় যদি ঐ ক্রেতা এমন গরিব

লোক হয় যে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব নয় তাহলে অন্য কাউকে শরীক করতে পারবে না। একক ভাবেই গরুটি কুরবানী করতে হবে। আর যদি ঐ ক্রেতা নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয় তবে সে অন্য কাউকে শরীক করতে পারবে। কিন্তু নেক কাজে নিয়্যাত পরিবর্তন ঠিক নয়।

- কুরবানীর পশু যবাই করার পূর্বে যদি কোন শরীক ব্যক্তি মারা যায় এবং তার বালেগ ওয়ারিসগণ যদি মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে কুরবানী করার অনুমতি প্রদান করে তাহলে সকলের কুরবানী দুরস্ত হবে। আর যদি ওয়ারিসগণ নাবালেগ হয় অথবা বালেগ ওয়ারিসগণ যদি অনুমতি প্রদান না করে তবে মৃত ব্যক্তির প্রদত্ত অংশ কুরবানীর আগে পৃথক না করা পর্যন্ত কারও কুরবানী সহীহ হবে না।
- যদি কুরবানীর পশু হারিয়ে যায় ও তৎপরিবর্তে অন্য একটি পশু খরিদ করা হয় তারপর প্রথম খরিদকৃত পশুটিও পাওয়া যায় এমতাবস্থায় ক্রেতা যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়, তবে যে কোন একটি পশু কুরবানী করলে তার ওয়াজিব কুরবানী আদায় হয়ে যাবে। আর যদি লোকটি গরিব হয় তবে উভয় পশু কুরবানী করা তার উপর ওয়াজিব হবে।
- পশু যবাই করার পর যদি পেটে জীবিত বাচ্চা পাওয়া যায় তবে ঐ বাচ্চাও যবাই করে দিবে এবং এর মাসং খাওয়াও দুরস্ত আছে। অবশ্য তা যবাই না করে সাদাকা করে দেওয়াও জায়েয।
- যে পশুর দু'টি চোখ অন্ধ বা একটি চোখ পূর্ণ অন্ধ বা এক তৃতীয়াংশের বেশি নষ্ট হয়ে গিয়েছে, এ ধরনের পশু কুরবানী করা বৈধ নয়। অনুরূপভাবে যে পশুর একটি কান বা লেজের এক তৃতীয়াংশের বেশি কেটে গিয়েছে এরূপ পশুও কুরবানী করা বৈধ নয়।

কুরবানীর সময়কাল হল যিলহজ্জের ১০ তারিখ হতে ১২ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত। এই তিন দিনের যে কোন এক দিন কুরবানী করা জায়েয।

কুরবানীর দিন ও সময়

কুরবানীর সময়কাল হল যিলহজ্জের ১০ তারিখ হতে ১২ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত। এই তিন দিনের যে কোন এক দিন কুরবানী করা জায়েয। তবে প্রথম দিন কুরবানী করা সর্বাপেক্ষা উত্তম। তারপর দ্বিতীয় দিন, তারপর তৃতীয় দিন।

যিলহজ্বের ১২ তারিখ সূর্যাস্তের পর কুরবানী করা বৈধ নয়। ঈদুল আযহার নামাযের পূর্বে কুরবানী করা বৈধ নয়। অবশ্য যে স্থানে ঈদের নামায বা জুমুআর নামায দুরস্ত নয় সে স্থানে ১০ যিলহজ্জ ফজরের নামাযের পরে কুরবানী করা বৈধ আছে।

যবাই করার পদ্ধতি

নিজের কুরবানীর পশু নিজ হাতে যবাই করা মুস্তাহাব। যদি নিজে যবাই করতে না পারে তবে অন্যের দ্বারা যবাই করাবে। এমতাবস্থায় নিজে পশুর কাছে দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম।

যবাই করার সময় কুরবানীর পশু কিবলামুখী করে শোয়াবে, অতঃপর بسم الله الله أكبر বলে যবাই করবে। ইচ্ছাকৃত বিসমিল্লাহ পরিত্যাগ করলে যবাইকৃত পশু হারাম বলে গণ্য হবে। আর যদি ভুলক্রমে বিসমিল্লাহ বাদ পড়ে যায়, তাহলে তা খাওয়া জায়েয আছে।

কুরবানীর সময় মুখে নিয়্যাত করা জরুরি নয়। অবশ্য মনে মনে নিয়্যাত করবে যে, আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানী করছি। তবে মুখে দু'আ পড়া উত্তম।

কুরবানীর পশু কিবলামুখী করে শোয়ানোর পর নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করবে।

انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا وما أنا من المشر كين ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم منك ولك.

তারপর بسم الله الله أكبر বলে যবাই করবে।

এরপর যবাই করে নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করবে;

اللهم تقبله منى كما تقبلت من حبيبك محمد و خليلك ابرا هيم عليهما الصلوة و السلام.

যদি নিজের কুরবানী হয় তবে منى বলবে, আর যদি অন্যের বা অন্যদের কুরবানী হয় তবে من শব্দের পরে দাতার বা দাতাগণের নাম উল্লেখ করবে।

যবাই করার সময় চারটি রগ কাটা জরুরী: ১. কণ্ঠনালী, ২. খাদ্যনালী, ৩. ওয়াদজান অর্থাৎ দুই পাশের দুটি মোটা রগ। এগুলোর যে কোন তিনটি যদি কাটা হয় তবুও কুরবানী শুদ্ধ হবে। কিন্তু যদি দু'টি মোটা রগ কাটা না হয়, তবে কুরবানী শুদ্ধ হবে না।

কুরবানীর গোশতের বিধান

কুরবানীর গোশত নিজে খাবে, নিজের পরিবারবর্গকে খাওয়াবে, আত্মীয়-স্বজনকে হাদিয়া দিবে এবং গরিব ও মিসকীনদের সাদকা করবে। গোশত বিতরণের মুস্তাহাব পদ্ধতি হল, তিনভাগ করে একভাগ পরিবার পরিজনের জন্য রাখবে এবং বাকী দুইভাগে একভাগ বন্ধু বান্ধবকে আর একভাগ গরিব মিসকীনকে বণ্টন করে দিবে।

গোশত বিতরণের মুস্তাহাব পদ্ধতি হল, তিনভাগ করে একভাগ পরিবার-পরিজনের জন্য রাখবে এবং বাকী দুইভাগের একভাগ বন্ধু বান্ধবকে আর একভাগ গরিব-মিসকীনকে বণ্টন করে দিবে।

- কয়েক ব্যক্তি একসাথে শরীক হয়ে যদি একটি গরু কুরবানী করে তবে পাল্লা দ্বারা মেপে সমানভাবে গোশত বণ্টন করে নিবে। অনুমান করে বণ্টন করা জায়েয নয়। অবশ্য যদি গোশতের সঙ্গে মাথা, পায়া এবং চামড়াও ভাগ করে দেওয়া হয় তবে যেভাগে মাথা, পায়া এবং চামড়া থাকবে সে ভাগে যদি গোশত কম হয় তবে এ বণ্টন দুরস্ত হবে। আর যে ভাগে গোশত বেশি ঐ ভাগে মাথা, পায়া বা চামড়া দিলে বণ্টন দুরস্ত হবে না।
- কুরবানীর গোশত অমুসলিমকে দেওয়াও জায়েয। কিন্তু মজুরী বাবদ দেওয়া জায়েয নয়। অবশ্য মুসলিমকে দেওয়াই উত্তম।
- কুরবানীর গোশত কুরবানী দাতার জন্য বিক্রি করার মাকরূহ তাহরীমী। যদি কেউ বিক্রি করে তাহলে ইহার মূল্য সাদকা করা ওয়াজিব।
- কসাইকে গোশত বানানোর মজুরী স্বরূপ গোশত, চামড়া, রশি প্রভৃতি দেওয়া জায়েয নয়। পারিশ্রমিক দিতে হলে ভিন্ন ভাবে আদায় করবে।
- গরু, মহিষ বা উটের মধ্যে কয়েক ব্যক্তি শরীক থাকলে তারা নিজেদের মধ্যে গোশত ভাগ করে দেওয়ার পরিবর্তে যদি সমস্ত গোশত একত্রে গরিবদের মধ্যে বিতরণ করে অথবা রান্না করে তাদের খাওয়ায় তবে ইহাও জায়েয। কিন্তু শরীকদের কোন একজন ভিন্নমত প্রকাশ করলে জায়েয হবে না। কুরবানীর গোশত তিনদিনের বেশি সময় জমা করে রাখাও জায়েয আছে।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. ইতিহাসের সর্বপ্রথম কুরবানী-
   ক. হযরত আদমের দুইপুত্রের দেওয়া কুরবানী;
   খ. হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক প্রদত্ত কুরবানী;
   গ. হযরত মুহাম্মদ (স) কর্তৃক প্রদত্ত কুরবানী;
   ঘ. হযরত ইসমাঈল (আ) কর্তৃক প্রদত্ত কুরবানী।

২. কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার জন্য-
   ক. নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হতে হয়;
   খ. সে সম্পদের উপর এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়;
   গ. নিসাব পরিমাণ সম্পদ হওয়া শর্ত নয়;
   ঘ. ক ও খ উভয় উত্তরই সঠিক।

৩. কোন পশু দ্বারা কুরবানী বৈধ নয়-
   ক. গাভী;
   খ. খরগোশ;
   গ. হরিণ;
   ঘ. খ ও গ উভয় উত্তর সঠিক।

৪. কুরবানীর সময়কাল-
   ক. ১০ যিলহজ্জ;
   খ. ১১ যিলহজ্জ;
   গ. ১০ থেকে ১২ যিলহজ্জ পর্যন্ত;
   ঘ. ১০ থেকে ১২ যিলহজ্জ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত।

৫. যবাই করার সময়-
   ক. কালিমায় শাহাদাত পড়তে হয়;
   খ. বিসমিল্লাহ পড়তে হয়;
   গ. পীর সাহেবের নাম উল্লেখ করতে হয়;
   ঘ. কিছুই পড়তে হয় না।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. কুরবানীর ইতিহাস লিখুন।
২. কাদের ওপর কুরবানী ওয়াজিব? উল্লেখ করুন।
৩. কয় প্রকার পশু দ্বারা কুরবানী দেওয়া যায় এবং এ পশুগুলো কেমন হতে হয়? বর্ণনা করুন।
৪. কুরবানীর দিন ও সময় উল্লেখ করুন।
৫. যবাই করার পদ্ধতি আলোচনা করুন।
৬. কুরবানীর গোশতের বিধান বর্ণনা করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. কুরবানী সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।